বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা

তারিফ রহমান

শিক্ষা চিকিৎসাসহ সকল ক্ষেত্রকে ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত করবার নীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াতেই বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ও বিস্তার। কর্তাব্যক্তিদের ধারণা ছিলো এধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেদের অধিকারবোধহীন হবে, ব্যক্তিস্বার্থ পূরণে আত্মকেন্দ্রিক থাকবে, যন্ত্র হিসেবে ভালো কাজে দেবে। কিন্তু অন্যায় আর অবিচারে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও যে সামষ্টিক পরিচয়ে রুখে দাঁড়াতে পারে তার প্রমাণ এর মধ্যে বহুবারই তারা রেখেছে। এসব খবর অনেকবারই কর্তাদের মিডিয়া সম্পূর্ণ গায়েব করে দিয়েছে। কিন্তু সর্বশেষ আন্দোলন সব বাঁধ ভেঙে দিলো। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সেখানে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের এসব কাহিনী ও বিশ্লেষণ নিয়ে এই লেখা।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ছাত্র আন্দোলন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এক শব্দবন্ধে খুব কমই শোনা যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলে অথবা ফার্মের মুরগি বলে গালমন্দ করার লোকজন আমাদের সমাজে কম নয়। যদিও এইসব শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বলার মতো কোনো গবেষণা নেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর দিকে এ ধরনের চিন্তার বাস্তব প্রেক্ষিত থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বছরের পর বছর সংকুচিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বাজেট অর্থনৈতিকভাবে কম সচ্ছল পরিবারের সন্তানকেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ নিতে বাধ্য করেছে। এভাবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনমিতির পরিবর্তন হয়ে গেছে। যে কারণেই হোক, সময়ে সময়ে আমরা দেখলাম কিভাবে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ারা ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে, যা একসময় অচিন্তনীয় ছিল। অতি সাম্প্রতিক ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন পরিবর্তিত অবস্থার বাস্তব চিত্রই প্রকাশ করল।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি আর বিশ্বরাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন যেন একই সূত্রে গাঁথা। সত্তরের দশক থেকেই আমরা যে 'নয়া উদারনৈতিক' অর্থনীতির প্রসার লক্ষ করলাম, সেটাকে খুব অল্প কথায় এভাবে বলা যায়: সবকিছুর ঢালাও বেসরকারীকরণ, ধনিক শ্রেণির ওপর থেকে কর অবলোপন এবং সর্বোপরি সবকিছুকেই বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা। অন্যভাবে বললে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ এবং একটি শ্রেণির কাছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার আত্মসমর্পণ আজকের তথাকথিত উদারনৈতিক অর্থনীতির মূলনীতি। এর হাত অনেক বড়, এখানে সবকিছুই বিক্রয়যোগ্য। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক প্রয়োগ বার্লিন দেয়ালের পতন থেকে শুরু। প্রখ্যাত জার্মান ইতিহাসবিদ মাইকেল স্টার্মারের মতে, বার্লিন দেয়ালের পতনে শেষ হয় প্রণোদনামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, যা একসময় ইউরোপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বার্লিন দেয়ালের পতন ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী ঘোষণা করল। যে যেভাবেই ভাবুক, বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে নানা ধরনের উন্নয়ন সংস্থা এবং আইএমএফ, অত্যন্ত আক্রমণাত্মকভাবে এই নীতি বাস্তবায়ন শুরু করে, যা 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য' নামে পরিচিত।

> বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকপক্ষ বাক্‌স্বাধীনতা রুদ্ধ করতে নিকৃষ্ট চেষ্টাই করেছে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো ছাত্রকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার বা যে কোনো সময়ে আত্মপক্ষ সমর্থন ছাড়াই গুরুতর জরিমানা করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় আচরণবিধি হলো প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা দমনমূলক ক্ষমতার নির্লজ্জ প্রদর্শনী। একই সাথে শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বার্ষিক নবায়নযোগ্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়।

অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগতভাবে দুর্বল বাংলাদেশ 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য'র জালে আটকা পড়ল সহজেই। প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিবৃত্তিক ও নীতিনির্ধারক বলয়গুলো একই সুরে কথা বলতে শুরু করল। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংকোচন ও বিলোপ সাধারণ নিয়মে পরিণত হলো। আশির দশকের শুরু থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাট, চিনি এবং অন্যান্য কল-কারখানায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হয়, যার ফলে সেগুলো বন্ধ অথবা নিলামে উঠতে বাধ্য করা হয়। অতি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষাব্যবস্থাও 'নয়া উদারনৈতিক ব্যবস্থা'র হিংস্রতা থেকে রেহাই পায়নি। এই পরিবর্তন অবশ্য গোটা বিশ্বেই চলছিল। চতুর আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক প্রতিটি ঋণ অথবা সাহায্য কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নয়া উদারনৈতিক ব্যবস্থার শর্তগুলো জুড়ে দিতে থাকে। এই নীতির হাত ধরে ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করা হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ প্রবেশ করে এক নতুন পর্বে। এর পরম্পরায় সৃষ্টি হয় এ অঞ্চলের প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় 'নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি'। এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনার আগে আমরা যদি এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করতে চাই, তাহলে কী দেখতে পাই? সূচনালগ্নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ধারণাটির অনেক সমালোচক একে শিক্ষাকে পণ্য বানানোর হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করেন, যা সর্বৈব মিথ্যা নয়। যা হোক, শুধুমাত্র সমালোচনার ঘেরাটোপে বন্দি না থেকে আমরা যদি প্রথমেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবের সমর্থকদের যুক্তিগুলোর সারাংশ করি, তাহলে তিন ধরনের যুক্তি সচরাচর শুনতে পাই–

১. যেহেতু শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগের মতো পর্যাপ্ত টাকা সরকারের নেই, সেহেতু শিক্ষাব্যয়-সংক্রান্ত দায়ভার বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

২. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশ গমনেচ্ছু শিক্ষার্থীদের রাশ টেনে ধরার মাধ্যমে মেধাপাচার রোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

৩. শিক্ষার্থীরা সেশনজটমুক্ত পরিবেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই

পড়াশোনা শেষ করতে পারবে, কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ছাত্র রাজনীতি থাকবে না।

অনেকেই প্রথম দুই যুক্তিকে খোঁড়া মনে করতে পারেন। শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রগুলো ব্যবসার জন্য খুবই জনপ্রিয়, কারণ এইসব ক্ষেত্র নিরবচ্ছিন্ন চাহিদার জোগান দিতে পারে। সরকারের টাকা নেই–এই যুক্তি ধোপে টেকে না, কারণ সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানোর দায়িত্ব যাদের ওপর দিচ্ছে, তাদের ওপর কর আরোপ করেই প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে। অপর পক্ষে যাদের বিদেশে পড়ার মতো পর্যাপ্ত টাকা আছে, তাদের দেশের মধ্যে নিম্নতর বিকল্প গ্রহণ করার কথা নয়।

এই তিন যুক্তির মধ্যে তৃতীয়টি সবচেয়ে বেশি আপত্তিকর। প্রতিষ্ঠানটিগুলো সম্পূর্ণরূপে বিরোধিতাহীনভাবে চলবে এবং এটিই প্রতিষ্ঠানগুলো সৃষ্টির মূল ভিত্তি। বছরের পর বছর, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র রাজনীতির শোচনীয় অবস্থার পেছনে বিভিন্ন মহলের অবদান কী আমরা দেখেছি। যা হোক, প্রত্যেকেরই মনে রাখতে হবে যে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটির দুঃখজনক অধঃপতন ক্যাম্পাস রাজনীতির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই নিয়মটির হরহামেশাই প্রশংসা করে থাকেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত; পাকিস্তানের আমলে অথবা জেনারেল এরশাদবিরোধী আন্দোলনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের পর ছাত্র রাজনীতি ক্যাম্পাসের সমস্ত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে–এমন একটা ধারণা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এইসব বাস্তব প্রেক্ষিত বাদ দিয়েও বলা যায়, শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার না থাকা সরাসরি শিক্ষার্থীস্বার্থবিরোধী। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ অরাজনৈতিক করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। কারণ শেষ বিচারে এই ধরনের পরিস্থিতি শুধুমাত্র ক্ষমতাই কুক্ষিগত করে। যদিও পরে আমরা শিক্ষার্থীদের একযোগে উচ্চকণ্ঠ হতে দেখব।

আপসরফা যখন প্রায় নিষ্ফল, তখন প্রতিবাদকারীরা ১৩তম তলার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় এবং অবশিষ্ট তলাগুলোর দখল নেয়।

যে কোনো আন্দোলন সফল হবার প্রধান শর্ত হলো, আন্দোলনরত মানুষগুলোকে নির্ভয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকপক্ষ বাক্‌স্বাধীনতা রুদ্ধ করতে নিকৃষ্ট চেষ্টাই করেছে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো ছাত্রকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার বা যে কোনো সময়ে আত্মপক্ষ সমর্থন ছাড়াই গুরুতর জরিমানা করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় আচরণবিধি হলো প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা দমনমূলক ক্ষমতার নির্লজ্জ প্রদর্শনী। একই সাথে শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বার্ষিক নবায়নযোগ্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। অনেক নামিদামি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নীতিটি এখনো বজায় আছে। এর মধ্য দিয়ে তারা শিক্ষকদের সব সময় চাপের মধ্যে রাখতে চায়। স্থায়ী অথবা দীর্ঘমেয়াদি নিয়োগের দাবি অনেক দিনের, কিন্তু এইসব দাবি কখনোই দিনের আলো দেখে না। উপরন্তু চুক্তি নবায়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার ইচ্ছানুযায়ী হয়ে থাকে। অতএব, যে কোনো ধরনের দাবিদাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

এনএসইউ ২০০৯ : বেতন বৃদ্ধি বিরোধী ছাত্র আন্দোলন

শিক্ষার্থীদের সামনে অসংখ্য বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্বেও ২০০৯ সালে প্রথম ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হতে দেখা যায়। ২০০৯ সালের বসন্তকালীন সেমিস্টারের শেষের দিকে এনএসইউ যখন তার নতুন ক্যাম্পাস বসুন্ধরায় সরিয়ে নিচ্ছিল, গ্রীষ্মকালীন সেমিস্টার শুরুর আগেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব পড়ুয়ার বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ব্যাপী টিউশন ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি ক্যাম্পাস স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় শেষ প্রান্তে থাকা বনানী ক্যাম্পাসের কাছাকাছি কয়েকটি প্রচারপত্রে বিলি করে। ঠিক যে সময় সিদ্ধান্তটি শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রকাশ করা হয়, প্রায় সাথে সাথেই ছাত্রছাত্রীরা তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করে। বিক্ষোভের সময় প্রত্যক্ষদর্শী এবং অংশগ্রহণকারীদের মতে, আন্দোলনকারীদের সংখ্যা খুব অল্প সময়েই কয়েক হাজারে পৌঁছে। তারা সবাই একত্রে চিৎকার করে অসন্তোষ প্রকাশ করে। এতে প্রক্টর ও নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা বিহ্বল বোধ করেন। ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কী হতে পারে তার ধারণা না থাকায় হতবিহ্বল ও ভীত কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করে। পুলিশ এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) হাফিজ জি সিদ্দিকীকে পাহারা দিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে নিয়ে যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে, যতক্ষণ না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রতিজ্ঞা করে। যা হোক, কিছুদিনের মধ্যেই সেই প্রতিশ্রুতি ভাঙারও চেষ্টা করা হয়।

এনএসইউ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই টিউশন ফি বৃদ্ধির দ্বিতীয় চেষ্টা চালায়। এবার পূর্বপরিকল্পনামাফিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করতে টিউশন ফি বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয় ২০০৯-এর বসন্তকালীন সেমিস্টারের একেবারে শেষ কর্মদিবসে। পরবর্তী সেমিস্টারের প্রথম দিন বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভর্তি ও বিষয় নির্বাচন সংক্রান্ত কাজগুলো চালিয়ে নিচ্ছিল, যদিও ঠিক একই সময়ে ৫০-৬০ জন শিক্ষার্থী তাদের প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিবাদকারী শিক্ষার্থীরা ছিল ক্যাম্পাসের পেছনের প্রবেশপথে। প্রাথমিকভাবে অবস্থানগত কারণে তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি মোটামুটিভাবে অকার্যকর ছিল এবং এনএসইউ কর্তৃপক্ষ তাদের উপেক্ষা করার সব রকম চেষ্টাই চালিয়ে যায়। প্রতিবাদকারীরা এরপর একটু চতুর কৌশল গ্রহণ করে পেছনের প্রবেশপথ থেকে সামনের প্রবেশপথ সংলগ্ন রাস্তায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে শুরু করে। এর ফলে ওই রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গক্রমে রাস্তাটি শহরের ধনিক শ্রেণির এলাকায় ছিল।

এমতাবস্থায় পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। শহরের এক অংশে ভয়াবহ যানজটের কারণে অন্য এলাকায় অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যে কোনো উপায়েই হোক পুলিশ আলোচনার মাধ্যমে এনএসইউ কর্তৃপক্ষ ও আন্দোলনকারীদের বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যেতে রাজি করাতে সক্ষম হয়। আন্দোলনকারীরা ক্যাম্পাসে ফিরে আসা মাত্রই অন্য শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়। অতি দ্রুত তারা ভবনের প্রথম তিনটি তলা বন্ধ করে দেয়। ফোন লাইন এবং লিফটের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সকল প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই সময়ে একই ভবনের ১৩তম তলায়, অন্যান্য একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে উপাচার্যও তাঁর অফিসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। পুলিশ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেয় এবং সংকট প্রশমিত করার চেষ্টা করে। মিডিয়াকর্মীরা ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিত হতে থাকেন এবং নিজ

নিজ প্রতিষ্ঠানে রিপোর্ট করতে থাকেন। ভিসি গণমাধ্যমে বেতন বাড়ানোর পক্ষে প্রকাশ্য বিবৃতি দেন।

আপসরফা যখন প্রায় নিষ্ফল, তখন প্রতিবাদকারীরা ১৩তম তলার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় এবং অবশিষ্ট তলাগুলোর দখল নেয়। এই অচলাবস্থা থেকে উত্তরণে কোনো পক্ষই ছাড় দিতে রাজি ছিল না। এ সময় ঠিক দু-এক শ গজ দূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি ভবনে কে বা কারা ইট-পাথর ছুড়ে মারে। কিভাবে অথবা কারা পাথর ছুড়ে মারে, তা আজও প্রকাশ পায়নি। নাশকতার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ বিপুল বিক্রমে অবরুদ্ধ ক্যাম্পাসে লাঠিচার্জ শুরু করে, সেই সাথে টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করতে থাকে। অবিলম্বে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে দেয় এবং ব্যাপক ভাঙচুর শুরু হয়। ভিসি এবং অন্য কর্মকর্তারা পুলিশের সহায়তায় অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হন। এরপর রাস্তায় শুরু হয় শিক্ষার্থীদের সাথে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ। ভবনগুলোর প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয় এবং তার মালিক ভাঙচুরের প্রতিবাদে ছাত্রদের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।

কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক দিনের জন্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। কয়েক দিনের মধ্যে অভিভাবকরা সংবাদ সম্মেলন করে অধিক টিউশন ফি দিতে অনীহা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের সন্তানদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবি জানান। যেহেতু এই অভূতপূর্ব সংকট সম্পর্কে মালিকপক্ষের কোনো ধারণাই ছিল না, তারা আর দ্বিতীয়বার ঝুঁকি নিতে চায়নি। তারা একটা আপসরফায় পৌঁছে। টিউশন ফি চলমান ছাত্রদের জন্য একই থাকে, কিন্তু নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রদের বর্ধিত ফির ধকল নিতে হয়।

> বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এবং ২০১০, উভয়ই হলো শিার প্রতি প্রকাশ্য অবমাননা এবং তার চেয়েও বেশি নির্মম সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিার্থীদের প্রতি। আইনের বেশির ভাগ বিধান মালিকদের স্বার্থই রা করে, কোনো আইনই শিার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আন্দোলন ২০১৫: 'আমরা পুড়ে মরতে চাই না'

জানুয়ারি ২০১৫ ছিল বাংলাদেশের কারচুপির জাতীয় নির্বাচনের প্রথম বার্ষিকী। বিএনপি ও জামায়াতসহ বিরোধী দলগুলো সহিংস কৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা দেশ জুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক অবরোধের ঘোষণা দেয় এবং একযোগে বাস ও অন্যান্য গণপরিবহনে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর শুরু করে। বাছবিচারহীন সহিংসতায় অনেক মানুষ মারা যায়, এমনকি আজও অনেক মানুষ সেই সহিংসতায় পুড়ে ভুগছে। জীবিত পুড়ে মরার ভয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়। জানুয়ারি থেকে মার্চ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সপ্তাহান্তে ক্লাস নিতে থাকে; যদিও ছাত্র উপস্থিতির হার অনেক কম ছিল।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, এর কারণ যতটা না শিক্ষার্থী অনুপস্থিতির হার বেড়ে যাওয়া অথবা তাদের জীবনের ঝুঁকি, তার চেয়ে বেশি ছিল সেমিস্টার দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়। ফলে যথেচ্ছ মুনাফা কমে যাওয়ার উৎকণ্ঠা। এ কারণে কর্তৃপক্ষ ক্লাস পুনরায় শুরু করার একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়।

এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী গণপরিবহন ব্যবস্থার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল, কেউ কেউ আসে অনেক দূর থেকে। এবারও এনএসইউতে একটি অনলাইন পিটিশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত গ্যালারির সামনে একত্রিত হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। নির্ধারিত দিনে দুপুর নাগাদ গ্যালারি পূর্ণ হয়ে যায়, তারা একত্রে স্লোগান দিতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রক্টরের কার্যালয় প্রতিবাদ ভঙ্গ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ছাত্ররা ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের কাছাকাছি প্রধান চত্বরে জমায়েত হতে থাকে। তারা সংখ্যায় ছিল কয়েক হাজার। তাদের দাবি ছিল ক্লাস স্থগিত করা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাতায়াত পথে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

অবস্থা যখন খারাপের দিকে যাচ্ছিল, তখন ভিসি, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, ছাত্রবিষয়ক পরিচালক ও এনএসইউ নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ শিক্ষার্থীদের শান্ত করতে যান। প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে ছাত্রদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে এ ধরনের দাবিদাওয়া ছাত্রদের ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এটাও বলেন যে সাধারণ মানুষ এনএসইউয়ের ছাত্রদের ভদ্র-সভ্য হিসেবে জানে; তাই তারা যেন ক্লাসে ফিরে যায়। শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে 'ভুয়া ভুয়া ভুয়া' চিৎকার করে তার জবাব দেয়। কর্তৃপক্ষের প্রতিটি ব্যক্তি তাদের কথা শেষ হওয়ার পর ফিরে যায়। তারা বুঝতে পারে, ছাত্ররা শিগগিরই স্থান ত্যাগ করবে না। এরপর বিক্ষোভকারীরা প্রশাসনিক ভবনের দিকে এগোতে থাকে এবং একটি আসন্ন সহিংস সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় নিরাপত্তাপ্রধান পরবর্তী তিন দিন ক্লাস স্থগিতের ঘোষণা দেন। সাথে সাথে বিক্ষোভকারীরা উল্লাসে ফেটে পড়ে।

প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বাতাসের বেগে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সংক্রমিত হতে থাকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির চত্বর, এআইইউবির সামনের চৌরাস্তা ছাত্ররা দখল করে নেয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও একই সুরে স্লোগান দিতে থাকে, সেই সাথে চলতে থাকে অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ মিছিল। এটা ছিল সারাদেশে ছাত্র আন্দোলনের জন্য দারুণ এক মুহূর্ত। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করে। শিক্ষার্থীরা এই লড়াইয়ে আপাত জয়ী হলেও যুদ্ধ কিন্তু শেষ হয় না। মালিকদের জন্য এটা সহ্য করা ছিল চিন্তার বাইরে। পরের কয়েক দিন ধরে মালিকদের জোট এবং সরকার অত্যন্ত স্পষ্ট অবস্থান নেয়। মূলধারার মিডিয়ায় প্রতিবাদ সংবাদ হিসেবে এটি প্রকাশ করা হয়নি। টক শোগুলো সব অভিজাত বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের কাছে কুক্ষিগত ছিল। সকলেই অত্যন্ত নোংরাভাবে এক অভাবনীয় ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিল। ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ নাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খাত ধ্বংস করার এক ভয়ংকর পরিকল্পনার অংশ।

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব যদিও কখনোই প্রমাণিত হয়নি, তার পরও মালিকদের জোট আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যেটা আসলে ছিল এক নোংরা রাজনীতির চাল। অবিলম্বে তারা তাদের সমস্ত রেষারেষি ভুলে এক চরম নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকপক্ষের জোট (এপিইউবি) এই সিদ্ধান্তে আসে যে কর্তৃপক্ষ যে কোনো বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীকে অবিলম্বে বহিষ্কার করতে পারবে। বহিষ্কার ছাড়াও ওই শিক্ষার্থী অন্য কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পারবে না। স্বৈরাচারী এই সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মত ছিল।

এপিইউবি দ্বারা এমন একটি ঘোষণার পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সরাসরি এতে তাদের সমর্থন জানায়। তারা ঘোষণা দেয়, সকল ক্লাস স্বাভাবিক নিয়মে পুনরায় শুরু করতে হবে। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি) বিক্ষোভে অংশগ্রহণের জন্য নজিরবিহীন দ্রুততার সাথে ৫০ জন

শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করে। ইউজিসির ঘোষণা এপিইউবির পরোক্ষ সমর্থনের জন্য যথেষ্ট ছিল। সর্বোপরি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এবং ২০১০, উভয়ই হলো শিক্ষার প্রতি প্রকাশ্য অবমাননা এবং তার চেয়েও বেশি নির্মম সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি। আইনের বেশির ভাগ বিধান মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করে, কোনো আইনই শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়। এপিইউবি ও ইউজিসির পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘোষণা ছাত্রদের নিরাপত্তাহীন অবস্থাই অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনে। এখান থেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অরাজনৈতিক ও নিস্পৃহ ভাবার যে প্রবণতা, তার পরিবর্তন হতে শুরু করে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আন্দোলন ২০১৫: 'ভ্যাট দেব না, গুলি করো'

২০১৪ সালে কারচুপির নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর সরকারের প্রথম কাজ ছিল সমাজের ধনিক শ্রেণি এবং ক্ষমতাবানদের হাত শক্তিশালী করা। কারণ সরকার জানত, এরাই তাকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সাহায্য করবে। এই অলিখিত বোঝাপড়ার সমস্ত লুকোচুরি প্রকাশ্য হয় সরকারের প্রথম বাজেটে। বিশ্ববাজারে যখন জ্বালানি তেলের দাম অবিশ্বাস্য পড়তির দিকে, তখন বাংলাদেশ সরকার বাজার অর্থনীতির কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে কৃত্রিম উপায়ে তেলের দাম আগের বাজারমূল্যে গায়ের জোরে বজায় রাখে। ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বাণিজ্যে জড়িত ব্যবসায়ীদের খুশি রাখার জন্য তেলের দাম আগের পর্যায়ে রাখা হয়। বাজেট ঘোষণার আগেই বিদেশি বিনিয়োগের ৭০ বছর পুরনো স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়া হয় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে, যাতে বিত্তবানরা তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ দেশের বাইরে পাচার করতে পারে। এরই পরম্পরায় অর্থমন্ত্রী মুহিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের মতো ধনিক শ্রেণির ওপর করারোপ না করে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির ওপর ১০% ভ্যাট আরোপ করে। বাজেট ঘোষণার সাথে সাথেই এটা খুব পরিষ্কার হয়ে পড়ে যে শিক্ষার্থীদেরই টিউশন ফির ওপর এই অতিরিক্ত ভ্যাট দিতে হবে। স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে ছাত্র ও অভিভাবক মহল অসন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু তখনো অসন্তোষ রাজপথের আন্দোলনে পরিণত হয়নি। মানববন্ধন ও ছোট ছোট মিছিল চলছিল প্রেসক্লাবের সামনে থেমে থেমে। কিন্তু সংখ্যায় কম থাকার কারণে কর্তৃপক্ষের কোনো গরজ দেখা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মালিকরাও এই ভ্যাট আরোপে খুশি ছিলেন না, তাঁরা ভয় পাচ্ছিলেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত ছাত্র আন্দোলনের সূচনা করবে। এরই মধ্যে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ধরনা দেওয়ার পর ভ্যাটের পরিমাণ কমিয়ে ৭.৫% করা হয়।

> শীর্ষ পর্যায়ের বেশ কিছু আওয়ামী লীগ নেতাকে আমরা এ সময়টাতে ঘাবড়ে যেতে দেখেছি। তাঁরা অর্থমন্ত্রীকে যত দ্রুত সম্ভব এটি সমাধানের জন্য প্রকাশ্যে তাগিদ দিচ্ছিলেন।

অর্থমন্ত্রী মুহিতের ভ্যাট আরোপের এই সিদ্ধান্ত যে চরম নির্বুদ্ধিতার বহিঃপ্রকাশ তার প্রমাণ হলো, তিনিই ২০১০ সালে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ওপর ৪.৫% ভ্যাট আরোপ করার চেষ্টা করেন, যা একসময় রাজপথের সহিংস ছাত্র আন্দোলনে পরিণত হয় এবং সরকার তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। ২০১৫ সালে সেই একই ভ্যাট বর্ধিত হারে পুনরারোপ করার সিদ্ধান্তটি কোনো প্রকার আগপিছ চিন্তাভাবনা না করেই করা হয়েছে, নাকি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বাড়তি অর্থসংস্থান করার জন্য করা হয়েছে, সেই বিতর্ক ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকুক।

যদিও ছাত্র অসন্তোষ ধীরে ধীরে বাড়ছিল, তার আলামত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ ও সরকারের ওপর ব্যক্তিগত ঘৃণা প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তীব্র গণ-অসন্তোষ গণবিস্ফোরণে পরিণত না হওয়ার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করলে দুই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়–১. শিক্ষার্থীরা সরকার ও মালিকপক্ষের প্রতিহিংসাকে ভয় পাচ্ছিল, যার প্রমাণ সাম্প্রতিক ইতিহাসেই আছে, যার ফলশ্রুতিতে তারা এক ধরনের সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। ২. আবার যেহেতু বাজেট ঘোষণা হয় জুন মাসে, সে সময় গ্রীষ্মকালীন সেমিস্টার পুর্ণোদ্যমে চলছিল, ছাত্ররা ভ্যাট আরোপের পরিণতি পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হয়নি।

যে কারণেই হোক, শরৎকালীন সেমিস্টারের শুরুতে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বৃহস্পতিবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নতুন আরোপিত ভ্যাট অনুযায়ী তাদের টিউশন ফি সংশোধন করতে শুরু করে। এর ফলে সেই বর্ধিত টিউশন ফির আরোপিত জোয়াল শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে দারুণভাবে চেপে বসে। যদিও কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী ফি পরিশোধ করতে শুরু করে, একটা বিরাট গোষ্ঠীর জন্য সেটা বহন করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। ঠিক এই সময় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী সব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেয়, তারা রাজপথে নেমে আসে। শুরু হয় সড়ক অবরোধ। কৌশলটা অনেকাংশেই ২০০৯ সালে এনএসইউ ছাত্র বিক্ষোভের মতো ছিল। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আফতাবনগরে বাড্ডা লিংক রোড অবরোধ করে। অবরোধ শুরু হওয়া মাত্র ভয়াবহ যানজট শুরু হয়, ওই এলাকার সবকিছু থেমে যায়। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ হস্তক্ষেপ করে, পুলিশ শিক্ষার্থীদের রাস্তা ছেড়ে দিতে বলে। এ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলতে উদ্যোগী হয়। কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী, তারা শিক্ষার্থীদের সাময়িকভাবে অবরোধ তুলে নিতে রাজি করাতে সক্ষম হয় এবং তাদের ফিরিয়ে আনতে শুরু করে। ফিরে আসার সময় ছাত্র জমায়েতের ওপর বিনা উস্কানিতে পুলিশ রাবার বুলেট ছুড়তে শুরু করে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মাশফিকুর রাহমানসহ ৩৫ জন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়।

পুলিশের গুলি স্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করে, এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ছাত্রসমাজে এই ঘটনা ব্যাপক ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় তোলে। এমনকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একটা অংশও এই ঘটনার নিন্দা জানাতে পিছপা হয়নি। ঠিক পরের দিন ঢাকা থেকে সিলেট, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে অসন্তোষ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সারাদেশে ছাত্রসমাজ সড়ক অবরোধ করতে থাকে। অবস্থান ধর্মঘট ও অবরোধের শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতা ছিল অভূতপূর্ব। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা বাড্ডা লিংক রোড; এনএসইউ এবং আইইউবি, যমুনা ফিউচার পার্কের দুই পাশের রাস্তা; স্টামফোর্ড ও ড্যাফোডিল, ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর সড়কের অভিজাত এলাকা; ব্র্যাক এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বনানী, মহাখালী এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো দখল করে নেয়। সব কটি জায়গাই ছিল বিত্তবানদের আবাসিক এলাকা। উত্তরা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা উত্তর ঢাকাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। গণবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ করে ফেলে। খুব দ্রুত সিলেট ও চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধে যোগ দেয়। সারাদেশে যান চলাচল পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ততক্ষণে ছাত্রছাত্রীরা অবাধ্য জন্তুটাকে সামনে থেকে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে

ফেলেছে।

আন্দোলনের স্লোগান ছিল পরিষ্কার ও স্পষ্ট– NO VAT। দেশের সর্বত্র একই উচ্চারণে ছাত্র গণজাগরণের সূচনা হয়। কিছু কিছু স্লোগান এমনও ছিল–'ভ্যাট দেব না, গুলি করো'। প্রতিবাদীদের সংঘবদ্ধ আচরণ, স্লোগানের ধরন এবং আন্দোলনের ব্যাপকতা মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোকে লজ্জায় ফেলে দেয়। বিক্ষোভকারীদের বিপুল সংখ্যা ও ঐক্যবদ্ধ শক্তি পুলিশ প্রশাসনকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী অন্যান্য বাহিনী রাজপথ ছেড়ে দিয়ে রাস্তার পাশে অবস্থান নেয়। পরিস্থিতি সরকারের উচ্চপর্যায়কে ভীত ও নিরুপায় করে তোলে। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর দিন অর্থমন্ত্রী ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিকে এক কথায় নাকচ করে দেন। কিন্তু আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা ও ঐক্যবদ্ধ শক্তি সরকারদলীয় রাজনীতিবিদদের বিচলিত করে তোলে। যেহেতু সরকারের কোনো বৈধতা নেই, তারা ভয় পাচ্ছিল এই আন্দোলন না আবার সরকারবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। অবশেষে বিকেল ৫টায় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা দেন যে শিক্ষার্থীদের ভ্যাট দিতে হবে না, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভ্যাট পরিশোধ করবে টিউশন ফি না বাড়িয়েই।

অর্থমন্ত্রীর ঘোষণাকে আন্দোলনকারীরা প্রথমে আনন্দের সাথে স্বাগত জানায়। যদিও অনেকেই এই ঘোষণাকে বিশ্বাস করেনি; কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় মালিকপক্ষ আরোপিত ভ্যাট বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেবে। অর্থমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন আরো বিভ্রান্তির জন্ম দেয়, ঘোলা জলকে আরো ঘোলা করে। সাময়িকভাবে বিক্ষোভ প্রশমনের জন্য এই ঘোষণা একটা ভালো কৌশল হিসেবে কাজ করে। অনেক শিক্ষার্থী তাদের অবস্থান ছেড়ে বাসায় ফিরে যায়। যারা সরকারের কথায় বিশ্বাস করেনি তারা রাজপথ ছাড়েনি, কিন্তু এরা সংখ্যায় ছিল কম। এ অবস্থায় ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ও পুলিশ অবশিষ্ট ছাত্রদের লাঠিপেটা করে তাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ ও ছাত্রলীগের মাস্তানদের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর সহিংসতার খবর আসতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের ভ্যাট দিতে বলা রাজনৈতিকভাবে প্রায় অসম্ভব এবং হাস্যকর এক আবদার ছিল, কারণ মালিকপক্ষ হলো বিত্তবান, তারাই হলো অবৈধ সরকারের ক্ষমতায় থাকার রক্ষাকবচ। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী নির্লজ্জের মতো তাঁর পূর্ববর্তী বিবৃতি প্রত্যাহার করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে এ বছর ভ্যাট দিতে হবে না, কিন্তু পরের বছর থেকে দিতে হবে। বক্তব্যটির মধ্যে একটা নিচু মানের চালাকি ছিল, কারণ অনেক ছাত্রছাত্রীই চলতি সেমিস্টারের ভ্যাট দিয়ে দিয়েছিল আর সেটা ছিল বছরের শেষ সেমিস্টার। তাছাড়া এটা ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের নির্লিপ্ত মনোভাবের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। অবশ্য সরকারের গণভিত্তি আর ক্ষমতার উৎস যাচাই করলে অর্থমন্ত্রীর সুর পরিবর্তন যথেষ্ট প্রত্যাশিতই ছিল।

মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতির পূর্বেই এপিইউবি খেয়াল করে যে বিদ্যমান আইন কোনোভাবেই ছাত্রছাত্রীদেরকে ভ্যাট দিতে বাধ্য করতে পারে না। শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই বেশ ক্ষিপ্ত ছিল এবং সেপ্টেম্বর ১৩ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল। দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল, মন্ত্রী মহোদয় ও মালিকপক্ষের একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর খেলা ততই জমে উঠছিল। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের দাবিতে আপোসহীন। সুস্পষ্টভাবেই তাদের ক্ষোভ ছিল অর্থমন্ত্রী ও সরকারের ওপর। তারা বেশ পরিষ্কার করেই বোঝাতে পেরেছিল তাদের দাবি– NO VAT।

রাস্তাঘাট অবরোধ করা শুরু হয় সেপ্টেম্বর ১৩ থেকে এবং ঢাকা শহরের পুরো ট্রাফিক ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। মন্ত্রী মহোদয়ের একগুঁয়েমি পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করে তোলে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আগেভাগেই ঈদের ছুটি ঘোষণা করে। অন্যদিকে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ঘোষণা দেয় যে তারা আগামী তিন বছরে কোনো ধরনের টিউশন ফি বাড়াবে না। এ সবকিছুতেই সরকারের ওপর চাপ বাড়ছিল। শীর্ষ পর্যায়ের বেশ কিছু আওয়ামী লীগ নেতাকে আমরা এ সময়টাতে ঘাবড়ে যেতে দেখেছি। তাঁরা অর্থমন্ত্রীকে যত দ্রুত সম্ভব এটি সমাধানের জন্য প্রকাশ্যে তাগিদ দিচ্ছিলেন। সেপ্টেম্বর ১৪-তে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নেয় সব ধরনের ভ্যাট প্রত্যাহার করার। আনন্দে উচ্ছ্বসিত ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ তুলে নেয়।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, এ রকম একটা সুসমন্বিত আন্দোলনের পেছনে কারা ছিল? প্রত্যক্ষদর্শী ও মিডিয়ার রিপোর্ট থেকে এটা বেশ পরিষ্কার যে এটা ছিল তৃণমূল পর্যায়ের একটা আন্দোলন। যদিও এই আন্দোলনে অনেক ছাত্র সংগঠন, বিশেষত বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল, তবু এটার কৃতিত্ব মূলত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের, যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদেরকে ওই সময়ে সংগঠিত করেছিল। যা হোক, এই ছোট্ট পরিসরে আরো কিছু বিষয় আলোচনার বাইরে থেকে গেল, যেগুলো আন্দোলনটির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারত। প্রথমত মিডিয়ার ভূমিকা এবং দ্বিতীয়ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের ভূমিকা। মূলধারার/বাণিজ্যিক মিডিয়া হাউসগুলোর ভূমিকা অতীতের থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। ওদের করা কাভারগুলোতে গভীরতা তো ছিলই না, বরং উল্টো এটিকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টাটাই ছিল হাস্যকরভাবে প্রকট। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে আন্দোলনের কারণে যানজটে ভোগান্তির ওপর করা নিউজগুলোর কথা।

অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা মূলত তাঁদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লাইন অনুসরণ করেছেন। কারণটা অনুমান করাও কষ্টসাধ্য নয়। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা বিবেচনায় নিলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের শিক্ষকদের বেশ ভালোই বেতন দিয়ে থাকে। শিক্ষকতা একটি মর্যাদাপূর্ণ পেশা থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষমতাবলয়ে প্রবেশ করার স্লুইসগেটে এবং শিক্ষকরা হয়ে দাঁড়িয়েছেন উচ্চবর্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষমাণ এক শ্রেণি।

পরিশেষে, আমরা যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের নিয়ে একটি বাস্তবিক পর্যালোচনা করি তাহলে বেশ পরিষ্কার দেখতে পাব যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বোচ্চ পর্যায়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়া লোকজনের সংখ্যা খুবই কম। এটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রদেরকে এক ধরনের বৈধতার সংকটে ফেলে দেয় এবং যা থেকে উত্তরণে তারা আজও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, তারা সঠিক পথেই আছে।

তারিফ রহমান: প্রভাষক, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: tarifspeaks@gmail.com

[তারিফ রহমানের A Brief History of Students' Struggle at Private Universities শীর্ষক লেখাটি সর্বজনকথা'র জন্য অনুবাদ করেছেন **শরীফ হাসান ও মাহবুব রুবাইয়াৎ**]